The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVIII, 2022 (pp. 93 - 102)
Published in July, 2025

রাসুলুল্লাহর (সা.) সিরাতে উদারতার শিক্ষা

ড. মুহাম্মদ শফিউল্লাহ কুতুবী*

প্রতিপাদ্যসার: সেমেটিক ধর্মসমূহে উদারতা প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করলে, স্পষ্টতই দেখা যায় যে, এসব ধর্মেই সবচেয়ে সহিষ্ণুতা ও ঔদার্য সম্পর্কিত আল্লাহর নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু ইহুদি ও খ্রিস্টানধর্মের শিক্ষা এতোই বিকৃত হয়ে গেছে যে, বর্তমান যুগে তাদের সেই শিক্ষা অনুসরণ করা কঠিনই নয়, অসম্ভবও। অপরদিকে, ইসলামের দিকে তাকালে লক্ষ করা যায়, ইসলামের শিক্ষা তার সূচনা থেকেই মানুষের কাছে অপরিবর্তিত ও অবিকৃত অবস্থায় বহাল রয়েছে। ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মধ্যপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়। নবীজির (সা.) জীবনধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উদারতার উত্তম দৃষ্টান্ত রয়েছে; যা অনুসরণ করে মানবজাতি অন্ধকার ও অবক্ষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। এই নিবন্ধে মহানবির (সা.) জীবনের উদারতার দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে মানুষের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও উদারতা বিকশিত হয় এবং সর্বমানবিক সৌহার্দ গড়ে ওঠে।

ভূমিকা : ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যপন্থী জীবনব্যবস্থার নাম। শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিরূপ। উদারতা ও ভারসাম্য যে-কোনো সভ্য সমাজ বিশেষত মুসলিম সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। যেখানে ইনসাফ ও ভারসাম্য নেই সেখানে সহিষ্ণুতার পরিবর্তে জুলুম, অত্যাচার, বিভাজন এবং গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষার অন্তর্দ্বন্দ্ব, হিংসা, কলহ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি সহজেই ডালপালা ছড়াতে পারে। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রান্তিক চিন্তাধারায় মানবজাতিকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত করার উদাহরণ লক্ষণীয়। ইহুদিরা নিজ ধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে চরম মাত্রার ক্ষোভ উসকে দিচ্ছে আর খ্রিস্টানরা মানুষের প্রকৃতগত আবেগ ও ন্যায্য ক্ষোভ গোড়া থেকেই ধ্বংস করে দিতে চায়।

এ দুটি ধর্ম বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির প্রান্তসীমায় চলে গেছে। অথচ ইসলাম এই ইফরাত ও তাফরীত অর্থাৎ একপেশে অবস্থানের বিপরীতে ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাধারা উপস্থাপন করেছে। খ্রিস্টবাদে শক্তিমাত্রই একটি মন্দ বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত কিন্তু ইসলামের বক্তব্য হলো, কখনও পরিবেশ-পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এই শক্তির ব্যবহার শুধু পূণ্যের কাজই নয় বরং যুক্তিসিদ্ধ এবং ন্যায়সংগতও। খ্রিস্টবাদে অত্যাচারীকে প্রশ্রয় ও সুরক্ষা দেওয়া হয়। কেউ একগালে থাপ্পড় দিলে দ্বিতীয় গালটি এগিয়ে দিতে বলে। এটা কি বিশ্বজনীন শিক্ষা কিংবা চিন্তাধারা হতে পারে ? নাকি গোটা বিশ্বের জন্য এমনটি আদৌ প্রযোজ্য ? সামগ্রিক বাস্তবতাকে ধারণ করার মতো শিক্ষা কি এমন হবার কথা ? অত্যাচারীর সামনে শির অবনত করে সমাজে কখনও ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব নয়। বরং এতে সমাজে ভারসাম্যহীনতা, অন্যায় ও জুলুমের মাত্রাই বাড়তে থাকে। ইসলাম একটি ইনসাফভিত্তিক নীতিমালা উপস্থাপন করেছে। কুরআন মাজীদে নির্দেশনা এসেছে :

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"যে তোমার প্রতি সীমালঙ্গন করবে তুমি তার প্রতি ততটুকু সীমালঙ্গন করতে পারো যতটুকু সে করেছে" (সুরা বাকারা : ১৯৪)।

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের আরেকটি নির্দেশনা হলো :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ .

"আর আমি তাদের ওপর (দণ্ড হিসেবে) আবশ্যক করে দিয়েছি, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের পরিবর্তে চোখ, নাকের বদলে নাক, দাঁতের জন্য দাঁত এবং অন্যান্য জখমের ক্ষেত্রে সমান দণ্ড" (সুরা মায়েদা : ৪৫)।

জুলুমের প্রতিকার হিসেবে কিসাস বা শাস্তির সমতা ও ইনসাফের আইন রয়েছে ইসলামে। এটি মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও ভারসাম্যের নিশ্চয়তা দেয়। ইসলামের এ বিধান জুলুম-অত্যাচারকে প্রতিরোধ করার পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রে ধনী-গরিব, সবল-দুর্বল সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করে। এমন ইনসাফপূর্ণ আইন বাস্তবায়িত হলে সমাজে, শান্তি, নিরাপত্তা, সৌহার্দ-সম্প্রীতি, ঐক্য ও সংহতি গড়ে উঠবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

"হে বোধসম্পন্ন লোকেরা, কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন" (আল বাকারা, ১৭৯)।

আরও কিছু অসমতার অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো, ইহুদি ধর্মে পুরুষকে তালাকের ব্যাপারে নিরঙ্কুশ এখতিয়ার দেওয়া- যা প্রয়োগে সে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া এমন এখতিয়ারের ফলে সমাজে নারীর অধিকার বিষয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিপরীত দিকে ইসলাম পৃথিবীকে দিয়েছে ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ পথের নির্দেশনা। ইসলামে তালাক বৈধ হলেও আল্লাহর কাছে বৈধ বিষয়গুলোর মধ্যে এটি নিকৃষ্ট ও অপছন্দের কাজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসুল সা. বলেছেন,

إن أبغض الحلال عند الله الطلاق

"আল্লাহর কাছে তালাকের চেয়ে নিকৃষ্ট আর কোনো বৈধ বিষয় নেই" (আল বায়হাকি খ.৬, ৩১৬)।

অসাম্যের তৃতীয় উদাহরণটি হলো, খ্রিস্টান ধর্মে বৈরাগ্যবাদকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ কাজ হিসেবে উপস্থাপন। এ তত্ত্বের ফলে জাগতিক জীবনে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি এবং চরমপন্থার জন্ম হয়। এই মতবাদ গ্রহণ করলে ইহজীবনের প্রত্যেকটি জিনিস উদ্দেশ্যহীন সাব্যস্ত হবে। অথচ ইসলামের শিক্ষা হলো, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যাবতীয় বন্ধন-সম্পর্কে মানুষ পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করবে। যা তার ইহ ও পরকালে চূড়ান্ত সফলতার কারণ হবে। বৈরাগ্য জাগতিক জীবনে ভারসাম্যহীনতা ও চরম পন্থার জন্ম দেয়। পৃথিবীর কোনোকিছুই উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্ট নয় বরং প্রতিটির সৃষ্টি কোনো না কোনো উদ্দেশ্যের অনুগামী। জাগতিক আত্মীয়তা ও নিজের শারীরিক চাহিদাকে পিষে ফেলা কোনো বিচক্ষণতা নয় বরং সকল সম্পর্ককে অটুট রেখে সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন করার মধ্যেই ইহ ও পরকালীন জীবনের সার্থকতা নিহিত। আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন :

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

"আর বৈরাগ্যবাদ তো তাদের উদ্ভাবিত! আমি এটা তাদের ওপর ফরজ করিনি। ফলে তারা এটাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারেনি।" আল হাদিদ, ২৭)।

এ-আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, "আমাকে বৈরাগ্যবাদ অবলম্বনের হুকুম দেওয়া হয়নি" (ইবন্ হাম্বল খ.৬, ২২৬)।

উপর্যুক্ত কয়েকটি দৃষ্টান্তে ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয় ধর্মে বাড়াবাড়ি পরিদৃষ্ট হয়। বিশেষত, আজকের যুগে উক্ত দুই ধর্মের সেসব নির্দেশনা ও শিক্ষা মানুষের পক্ষে অনুসরণ কেবল কঠিনই নয় বরং প্রায় অসম্ভব। এমন প্রান্তিক নির্দেশনা ও বিধান মানুষের স্বভাববিরোধী। অন্যদিকে ইসলাম করণীয়-বর্জনীয় দু-দিকেই ভারসাম্য কায়েম করেছে। যা মানবীয় প্রকৃতির সঙ্গে পুরোপুরি যুৎসই ও স্বভাবসম্মত। ইসলামের এ বৈশিষ্ট্য সত্যই বিস্ময়কর।

রাসুলুল্লার সিরাতে উদারতার শিক্ষা

উদারতা এমন এক চারিত্রিক গুণ যা অবলম্বনের ফলে অনর্থক ও হীনকর্ম সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। শত্রুর সঙ্গে আচরণে উন্নত চিন্তা, আত্মবিশ্বাস, নীতিনিষ্ঠতা, কল্যাণ কামনা ও ক্ষমাশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে। এখানে সংকীর্ণতা ও প্রতারণার অবকাশ থাকে না। একজন উদারপ্রাণ মানুষ প্রতিপক্ষের তরফ থেকে হীন থেকে হীনতর আচরণ সহিষ্ণুতার গুণে সহ্য করে থাকেন অম্লানবদনে। এই উদারনীতির কারণে ইসলাম অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ও তাদের অসত্য উপাস্য-দেবতাদের প্রতি কটূক্তিকে মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ করেছে। এটাই ইসলামের সৌন্দর্য। এ উদারতার অন্যতম দৃষ্টান্ত কুরআন মাজীদের ঘোষণা :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"আর তারা আল্লাহ ব্যতীত যার পূজা-উপাসনা করে তাদেরকে তোমরা গালমন্দ করো না। তারা না বুঝে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে আল্লাহকে গালমন্দ করে বসবে" (সুরা মায়েদা, ১০৮)। ইসলাম পৃথিবীতে উদারতার এক বলিষ্ঠ ভিত্তি স্থাপন ও পরিপূর্ণ সংবিধান পেশ করেছে। ঘোষণা করেছে, বিশ্বনবি (সা.) থেকে আদম (আ.) পর্যন্ত সকল পয়গাম্বরের ধর্ম মৌলিকভাবে এক ও অভিন্ন। তাহলে আসমানি ধর্মগুলোর অনুসারীদের মধ্যে বিভেদ ও বিভাজন থাকা সমীচিন নয়। আরও ঘোষিত হয়েছে, "ইসলাম গ্রহণের জন্য জবরদস্তি অনুমোদিত নয়" (সুরা বাকারা, ২৫৬)। কাজেই, ইসলামে জবরদস্তি নয়– আছে ভালোবাসা ও মানবিকতা। ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া নয় বরং ইসলাম মানুষকে সুসম্পর্ক আর সম্প্রীতির ওপর অবিচলতা শিখিয়েছে। ইসলাম সৌহার্দ ও সামাজিক সম্প্রীতির এই পরিধিকে কোনো শ্রেণি বা স্তরে সীমাবদ্ধ করেনি। এটা স্থান ও সময়ের গণ্ডিতেও আবদ্ধ থাকেনি। ইসলাম ঘোষণা করেছে, গোটা সৃষ্টিজগতই আল্লাহর পরিবার। আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন,

الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.

"সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার, কাজেই, আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক প্রিয় যে আল্লাহর পরিজনের সঙ্গে সদাচার করে" (সুয়ূতি খ.২, ১১)।

শত্রুর সঙ্গে উদার আচরণের শিক্ষা

ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয়ধর্মে শত্রুর সঙ্গে সদাচরণের তাগিদ রয়েছে। ইহুদি ধর্মে বলা হয়েছে, 'কোনো গৃহপালিত পশু যদি পথ ভুলে তোমার বাড়িতে চলে আসে তা শত্রুর হলেও মালিকের কাছে পৌছে দাও।' তবে খ্রিস্টান ধর্মের পাদ্রিরা এমন কিছু আয়াত বা শ্লোক অস্বীকার করতে গিয়ে বলেন, শত্রুর জন্য শুভ কামনা তো করা যায় কিন্তু তাকে ভালোবাসা অসম্ভব। ভাবনার বিষয় হলো, ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মে উদারতার এসব বাণী কিতাবের পাতা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ; জীবনের পাতায় তা অনুপস্থিত। ইতিহাসে এর বাস্তব দৃষ্টান্ত কখনও দেখা যায়নি। কিন্তু ইসলাম শত্রুর

সঙ্গে উদার ব্যবহারের নীতি শুধু কিতাবের পাতায় বন্দি রাখেনি; খোদ আল্লাহর রাসুল হজরত মুহাম্মদ (সা.) তা আমল করে গোটা দুনিয়াকে অবাক করে দিয়েছেন।

মক্কা বিজয়ের দিন তিনি শত্রুকে কেবল ক্ষমা করেই থেমে যাননি বরং তাদের ঘরবাড়িকে নিরাপদ ঠিকানা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মহানবি (সা.) সেদিন উচ্চকণ্ঠে নির্দেশনা দিয়েছেন,

لا لا ! اليوم يوم الرحمة

"না ! না ! আজ দয়া প্রদর্শনের দিন" (ইবন্ আসাকির ৪৫৪)। মুসলমানদের প্রতি ইসলামের শিক্ষা ও আইনে অমুসলিমদের এ অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, তাদের ব্যাপারে সীমালঙ্গণ করা যাবে না বরং ইনসাফ ও ন্যায়বিচার পাওয়া তাদেরও অধিকার। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا

"আর তোমাদের সেসব শত্রুর দুশমনি– যা তোমাদেরকে মসজিদে হারামে প্রবেশের বাধা সৃষ্টি করছে– যেন তাদের প্রতি সীমালঙ্গনের কারণ না হয়" (সুরা আল মায়েদা, ৭)।

মোদ্দাকথা, ইসলাম শত্রুর সঙ্গে উদার আচরণ, ক্ষমা এবং তাদের প্রতি ন্যায়সংগত আচরণের শিক্ষা দেয়।

ইসলামি রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু

একটি রাষ্ট্রে সকল মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধর্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধ এক ও অভিন্ন হওয়া অসম্ভব। ইসলামি জীবনব্যবস্থায় সকল বর্ণ, গোত্র ও ধর্মের সহাবস্থানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে আদর্শহীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় কাগজে-কলমে রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে এক জাতি আখ্যায়িত করে সমান অধিকারের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা কখনও কার্যকর হয়নি। আজকের আধুনিক সভ্যতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও সংখ্যালঘুদের সার্বিক কল্যাণ এবং তাদের ন্যূনতম মানবিক অধিকারের কার্যকরি কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত রাজনীতিবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন, Democracy is a form of goverment that is never complately achieved. "গণতন্ত্র এমন একটি সরকার ব্যবস্থা যা কখনও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি" (ড. আহমদ আলী ৯)।

ইসলামি পরিভাষায় মুসলিম সমাজে বসবাসরত সংখ্যালঘু তথা অমুসলিমদের ক্ষেত্রে 'আহলুজ জিম্মাহ' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 'জিম্মাহ' শব্দের অর্থ, আহাদ, ওয়াদা, অঙ্গীকার, নিরাপত্তা, চুক্তি, প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব। এ নামকরণের রহস্য হলো, আল্লাহ, রাসুল ও মুসলমানদের সাথে তাদের অঙ্গীকার রয়েছে। মুসলমানদের মতো তারাও সকল নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে, থাকবে শান্তিতে, নিরাপদে (*আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ* খ.৭, ১০৪)।

অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার

ইসলামি বিধানমতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম গ্রহণে বা নিজস্ব ধর্মমত পরিবর্তনে কোনো চাপ সৃষ্টির প্রশ্নই আসে না। ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতার মূলে রয়েছে মহান আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ, তিনি বলেন :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

"ধর্মের (গ্রহণের) ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। সত্য ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে" (সুরা বাকারা,২৫৬)। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসুলকে উদ্দেশ করে বলেন,

أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

"আপনি কি মানুষকে জবরদস্তি করবেন যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে ?" (সুরা ইউনুস, ৯৯)। শক্তি প্রয়োগ করে কাউকে মুমিন বানানো যাবে না। তবে কেউ ইসলামের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলে তা ভিন্নকথা। নাজরানবাসীর সঙ্গে নবী করিম (সা.) যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, এতে তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন, তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। তাদের কোনো পাদ্রীকে তার পদ থেকে সরানো হবে না। তাদের সন্যাসীদেরকে উত্যক্ত এবং গির্জার চাবি রক্ষককে পদচ্যুত করা হবে না (মাসউদ ১৫৩)।

আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক

বর্তমানে গোটা দুনিয়ায় অশান্তি ও হানাহানি ব্যাপকভাবে, আশঙ্কাজনক হারে ছড়িয়ে পড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে উদারতা, সহিষ্ণুতা ও আন্তঃধর্মীয় সুসম্পর্ক শক্তিশালী করার মাধ্যমে বৈশ্বিক সংহতি জোরদার করতে হবে। এর মাধ্যমে অশান্তি, নৈরাজ্য, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দূর করা সম্ভব। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী অপরের প্রতি সহিষ্ণুতা ও উদারনীতি অবলম্বন করে হানাহানি ও সংঘাতমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আল্লাহর রাসুল (সা.) একবার খ্রিস্টানদের একটি দলকে সাময়িকভাবে মসজিদে তাদের ধর্মীয় উপাসনার সুযোগ দিয়েছিলেন। রাসুলের (সা.) হিজরতের পর বিশেষত মদিনায় মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠার পর তাদের সঙ্গে অনেক চুক্তি, স্মারক, বন্দিবিনিময় হয়েছে। এই ধারা শুরু হয় প্রথম বাইয়াতে আকাবা ও দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা বিশেষত মদিনা সনদের মাধ্যমে। বিভিন্ন গোত্র ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি কমপক্ষে পঞ্চাশটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। যাদের মধ্যে ছিলো আরবের মুশরিক, মুনাফেক, ইহুদি, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজারী প্রভৃতি সম্প্রদায়। যথা- বনু যারআ, বনু রাবিয়ার সঙ্গে শান্তিচুক্তি, হোদায়বিয়ার সন্ধি, সেন্ট ক্যাথারিনের সঙ্গে চুক্তি, খায়বার চুক্তি, তায়েফ সমঝোতা স্মারক। অনুরূপভাবে নাজরান, বনু ইখসাশের নামে শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক বার্তা প্রেরণ, বনি গাজিয়া ও জাবালে তাহামার অধিবাসীদের উদ্দেশে পত্র প্রেরণ ছাড়াও বিভিন্ন গোত্রের ইহুদিদের প্রতি নিরাপত্তা-বিষয়ক পত্র প্রেরণ। জারবা, আজরাহ ও আহলে মুকান্নার সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বনু জামরার সঙ্গে শান্তিচুক্তি, বনু গিফার ও মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপটে শান্তিচুক্তি (শাহবাজ ১৪৫)।

নবিজির উপর্যুক্ত সমঝোতা স্মারক ও শান্তিচুক্তিগুলো থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি ইসলামকে পৃথিবীর সামনে ভারসাম্যপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানুষের কাছে পেশ করেছেন। অনুরূপভাবে অমুসলিমদের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়িয়েছেন এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় জোরালো অবদান রেখেছেন। তৎকালে তিনি আগে থেকেই ধর্মের নামে সমাজে শুরু হওয়া ফ্যাসাদ, নৈরাজ্য, সংঘাত নির্মূল করে গোটা মানবজাতির মধ্যে সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দিয়েছেন। মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতি উদারতা ও সম্মান প্রদর্শনের। যাতে ইসলামি সাম্রাজ্যের মধ্যে বসবাসকারী ইহুদি-খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে জীবনযাপন করতে পারেন। তারা যেন ধর্মপ্রচার, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি স্বাধীনভাবে ও নির্বিঘ্নে সম্পাদন করতে পারেন। তাদের সামাজিক, পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো জবরদস্তি থাকবে না। এই নিরাপত্তা-ব্যবস্থার জন্য তারা জিজিয়া-ট্যাক্স দেবে। এর বিনিময়ে মুসলমান সরকার তাদেরকে বহিঃশত্রু বা সীমান্তের বাইরের কোনো শক্তির হামলা থেকে সুরক্ষা দেয়। তাদের জীবনের নিরাপত্তা ও শত্রুর আগ্রাসনের বেলায় তাদেরকে সাহায্য করা হবে–মর্মে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে (শাহবাজ ১৪৫)।

মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন অমুসলিমদের সঙ্গে সদাচরণ করা হয়। যদি মুসলমানদের ওপর কেউ আক্রমণ করে বসে তবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের (ডিফেন্সিভ) অনুমতি দেওয়া হয়েছে মুসলিমদের। সে ক্ষেত্রেও ইসলামের যুদ্ধনীতি অনুসরণের কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্বরতা, জবরদস্তি ও জুলুম-নির্যাতন আর অন্যায়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। যতদূর সম্ভব লড়াই-সংঘাত এড়ানো এবং সমঝোতা চুক্তি মেনে চলার ব্যাপারে জোর দিয়েছে। মোটকথা, মহানবির (সা.) সমঝোতা চুক্তিগুলো ছিলো অত্যন্ত সুসংহত। যার ফলে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শে পৃথিবীর নতুন নতুন জনপদ আলোকিত হয়েছে (শাহবাজ ১৪৫)।

আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের মান-মর্যাদা

ইসলামি শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সরকারি হস্তক্ষেপমুক্ত স্বাধীন বিচারব্যবস্থা। ইসলামি আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু বলে তাদের প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব বরদাশত করে না। যে কোনো মজলুম মানুষ ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে নিরাপত্তা ও হেফাজতের দৃঢ় আশা পোষণ করতে পারে। জালিমের হাত থেকে তার অধিকার ফিরে পাবার আশা করতে পারে এমনকি তার প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রপতি হলেও এর কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। হজরত আলীর (রা.) শাসনামলে জনৈক খ্রিস্টান তার লৌহবর্ম চুরি করেছিলো। হজরত আলীর দাবি সত্য হওয়ার পরও আদালতে তিনি প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর বিপক্ষে এবং খ্রিস্টান লোকটির পক্ষে বিচারক রায় দিয়েছিলেন। পরে এমন ন্যায়সংগত দুঃসাহসী রায়ে অভিভূত হয়ে লোকটি নিজের মিথ্যা দাবির কথা স্বীকার করে বর্ম ফেরত দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। হজরত আলী বললেন, তুমি যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করেছো এটি তোমার কাছে থাক (ইবন্ কাসীর হা.নং- ২৬৫৪)।

অমুসলিমদের সঙ্গে সামাজিক সম্প্রীতি

ইসলাম তার অনুসারীদের উন্নত আদর্শ এবং উঁচুমানের দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা দেয়। মুসলমানদের ওপর তার প্রতিবেশিদের (নিজের দিক থেকে আক্রমণের ব্যাপারে) নিরাপত্তাকে বাধ্যতামূলক করেছে। প্রতিবেশি মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম; ইসলাম মুসলমানদের জন্য যেভাবে সৎ প্রতিবেশির নিশ্চয়তা বিধান করতে চায় অনুরূপভাবে তা অমুসলিমের জন্যও করে থাকে। প্রতিবেশির সঙ্গে সদাচারণ প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয়। আবদুল্লাহ ইবন্ ওমর (রা.) একবার একটি ছাগল জবাই করার পর নিজের দাসকে হুকুম দিলেন কিছু গোশত প্রতিবেশির ঘরে দিয়ে আসার জন্য। দাস বললো, হে সর্দার, লোকটি তো ইহুদি ! জবাবে তিনি বললেন, ইহুদি হয়েছে তো কী হয়েছে ? এতটুকু বলে তিনি আল্লাহর রাসুলের বাণী উদ্ধৃত করেন :

ما زالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بالجارِ، حتَّى ظَنَنْتُ أنَّه سَيُوَرِّثُهُ.

“জিবরাইল (আ.) প্রতিবেশির প্রতি সদাচারের ব্যাপারে আমাকে সবসময় এতো বেশি তাগাদা দিয়েছেন, আমি আশঙ্কা করছিলাম, তাদেরকে আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পর্যন্ত বানিয়ে দেওয়া হয় কিনা” (আল বুখারি হা. নং- ৫৬৬৮)! কুরআন মাজীদে পড়শি বা পাশের বাড়ির লোকদেরকে ‘প্রতিবেশি’ সাব্যস্ত করে الصاحب بالجنب শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলিম-অমুসলিমের কোনো শর্তারোপ করেনি। অন্যদিকে প্রতিবেশিদের মধ্যে উপহার-উপঢৌকনের লেনদেন খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে মনের হিংসাও দূর হয়ে যায়। কোনো অমুসলিম আল্লাহর রাসুলের কাছে উপহার পাঠালে তিনি নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করতেন। তিনি মুকাউকিসের প্রেরিত উপঢৌকন গ্রহণ করেছেন। অনুরূপভাবে একবার একজন পাদ্রির পাঠানো একটি পোশাকের হাদিয়া আল্লাহর রাসুল (সা.) নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন এবং পরিধান করেছেন। আর সামাজিক সুসম্পর্কের অন্যতম অংশ হলো, (সমাজের) কেউ

অসুস্থ হলে তার শুশ্রুষা করা, সহানুভূতি জানানো এবং অসুস্থ ব্যক্তিকে সাহস যোগানো। ইসলামে রোগীর সেবাযত্নের বেলায় মুসলিম-অমুসলিম কোনো শর্ত নেই (ইবন্ হাম্বল খ.৩, ৩২৭)।

হজরত আনাস ইবন্ মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ইহুদি বালক নবিজির বাড়িতে কাজ করতো। সে একবার অসুস্থ হলে তিনি তার খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য বালকটির বাড়িতে গিয়ে হাজির হন। তিনি তাকে ইসলাম কবুলের আহ্বান জানালে সে মুসলমান হয়ে যায়। এরপর তিনি (নবিজি) এ-কথাগুলো বলতে বলতে তার ঘর থেকে বের হন : "সকল প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি বালকটিকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন" (আল বুখারি হা.নং-৭৩৫৬)।

প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহারের অন্যতম মূলনীতি হলো, মেহমানদারি ও আপ্যায়ন। এটাও ইসলামের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যে, ইসলাম তার অনুসারীদের ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে মেহমানদারির নির্দেশ দেয় এবং এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহর নবি নিজের ব্যবহারিক জীবনে তা আমল করে দেখিয়েছেন। কোনো দেশের প্রতিনিধি বা দূত এলে তিনি তাদের মেহমানদারি করতেন। আবিসিনিয়ার খ্রিস্টানদের একটি প্রতিনিধিদলকে আপ্যায়নের দায়িত্ব খোদ নিজেই পালন করেন তিনি। তিনি বলেন, "তারা আমাদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ লোক; কাজেই আমি স্বয়ং তাদের সম্মান ও আপ্যায়ন করতে চাই" (*আল বায়হাকি* হা. নং-১৯২৫)।

উক্ত হাদিসসমূহে অমুসলিমদের সঙ্গে সদাচার, তাদের উপহার গ্রহণ, তাদেরকে মেহমানদারি ইত্যাদির নির্দেশ ও তাগিদ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে থেকে তাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি ইসলামে আছে।

মান-সম্ভ্রমের নিরাপত্তা

ইসলামের দৃষ্টিতে সংখ্যালঘুদের মান-সম্ভ্রম মুসলমানদের মান-সম্ভ্রমের মতোই পবিত্র ও সম্মানযোগ্য। সুতরাং সংখ্যালঘুকে কটাক্ষ করা, বেপরোয়া গালাগাল করা, অপবাদ দেওয়া, দোষারোপ করা এবং তাদের সঙ্গে মানহানিকর আচরণ সম্পূর্ণ অবৈধ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من النار.

"যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিমকে যেনার মিথ্যা অপবাদ দেবে, কিয়ামতের দিন তাকে দোযখের ছড়ি দ্বারা প্রহার করা হবে" (আলী ৯)।

নিজস্ব আইনে বিচার পাবার অধিকার

অমুসলিম সংখ্যালঘুদের পারিবারিক কর্মকাণ্ডসহ তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও উপাসনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় আইন অনুযায়ী পরিচালিত করার অধিকার ইসলাম তাদেরকে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইসলামি সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই। খলিফা ওমর ইবনু আবদুল আজিজ (রাহ.) একবার হাসান বসরী (রাহ.)-কে বললেন, "পারসিকরা নিজের মেয়ে এবং বিমাতাকে বিয়ে করে কিন্তু এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী খলিফাগণ কোনোরূপ আইনগত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, এর কারণ কী ? হজরত হাসান বসরী (রাহ.) উত্তরে বললেন, আপনাকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চলতে হবে। নিজের পক্ষ থেকে কোনো নতুন বিধান জারি করতে পারবেন না (মাসউদ ২১)।

রাজনৈতিক অধিকার

ইসলামি রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে কিছুটা বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এর কারণ হলো, ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম জনগোষ্ঠী কুরআন ও হাদিসকে বিশ্বাস করে না, তারা সেসব নীতিমালার ভিত্তিতে

আনুগত্যের মৌলিক শর্তাবলি পূরণ করতে পারে না। যার ওপর রাষ্ট্রের সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত এবং তারা সে ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধও নয়। এ জন্য ইসলাম তাদেরকে সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী পদে নিয়োগের অনুমোদন দেয় না। তবে সাধারণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের গঠনমূলক মতামত একজন মুসলমানের মতই গণ্য। খোলাফায়ে রাশেদার আমলে এসব ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করার অধিকার তাদের ছিলো। হজরত ওমর (রা.)- এর শাসনকালে মিসরের বিনইয়ামিন নামে কিবতীদের একজন বড় নেতা ছিলো। হজরত ওমর (রা.) যখন জানতে পারলেন যে, স্বীয় সম্প্রদ্রায়ে তার প্রভাব রয়েছে তখন তিনি মিসরের গভর্নর হজরত আমর ইবনুল আ'সকে (রা.) সাধারণ প্রশাসনিক কাজে তার পরামর্শ নেওয়ার জন্য লিখে পাঠিয়েছিলেন (মাসউদ ২১)।

জীবিকা নির্বাহ ও কর্মসংস্থানের অধিকার

মুসলমানদের মতো অমুসলিম নাগরিকগণও তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে যে কোনো কর্ম ও পেশা অবলম্বন করতে পারবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারিগরি, কৃষি ও চাকুরি প্রভৃতির দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। আইন বিশারদগণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও সব ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অমুসলিম নাগরিকদেরকে মুসলমানদের সমঅধিকার প্রদান করেছেন। তবে সুদের বিষয়টি ব্যতিক্রম এবং এ অধিকার বহির্ভূত। কারণ মুসলমানদের মতো অমুসলমানদের জন্যও সুদ সংশ্লিষ্ট লেনদেন পরিত্যাজ্য, কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। নবী করিম (সা.) 'হাজার' অঞ্চলের অগ্নিপূজারীদের নিকট প্রেরিত পত্রে লিখেন-"হয়তো তোমরা সুদভিত্তিক কাজ-কারবার ছাড়, নতুবা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কর" (আল কারযাভি ৩৪)।

বন্দিদের প্রতি ইসলামের উদারতা

মহানবি (সা.) বদর যুদ্ধে গ্রেফতার হওয়া বন্দিদের প্রতি অনুপম সদাচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা তাঁর উত্তম চরিত্রের বাস্তব নজির। হজরত ওমর (রা.) বলেন, তিনি জাবের ইবন্ আবদুল্লাহ থেকে শুনেছেন, বদরের যুদ্ধে গ্রেফতার হওয়া লোকদের মধ্যে আব্বাস ইবন্ আবদুল মুত্তালিব ছিলেন অন্যতম। বিধ্বস্ত অবস্থায় শরীর আবৃত করার মতো কাপড় ছিলো না। নবিজি তার জন্য কাপড় খুঁজছিলেন। লোকেরা আবদুল্লাহ ইবন্ উবাইর জামা এনে দেয় এবং এটা তার গায়ের যুৎসই মাপে মিলে যায়। আল্লাহর রাসুল সেই পোশাকটাই তাকে পরিয়ে দিলেন। মোটকথা, মানবসমাজের জন্য ছোট-বড় কোনো দিক এমন নেই যেখানে তিনি কোনো শিক্ষা ও আদর্শ রেখে যাননি (আল বুখারি হা.নং-৪৮৪৬)।

ক্রীতদাসদের প্রতি উদারতা

ইসলামের আগমনের পূর্বে ক্রীতদাসরা সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও অসহায় অংশ ছিলো। যাদের ভালো-মন্দ বিবেচ্য ছিলো না। বাজারি পণ্যের মতোই তাদের বেচাকেনা হতো। যা ছিলো মানবতার জন্য চরম অবমাননাকর বিষয়। বিশ্বনবি তাঁর উত্তম আদর্শের বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে সেই দাসপ্রথার ধারণাকে (থিউরি) বিলুপ্তির ভিত্তি স্থাপন করেন। একইসঙ্গে সমাজের স্বাধীন মানুষের মতো তাদের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এটা কেবলই ইসলামের একক বৈশিষ্ট্য। তবে সাধারণত, সেবক ও ভৃত্যদের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করা হতো না; তাদের সঙ্গে সদাচারণ করা হতো না। তিনি শিক্ষা ও নির্দেশনা দিলেন, তাদের অনুভূতি ও পছন্দকে যেন মূল্যায়ন করা হয়। পরিবারে তাদেরকে যেন ভাইয়ের মতো সম্মান দেওয়া হয়। দাসদের প্রতি সদ্ব্যবহারের তাগিদ দিতে গিয়ে রাসুল (সা.) বলেন, "কৃতদাসগণ তোমাদের ভাই। যাদেরকে আল্লাহ তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। কাজেই, যার ভাই তার অধীনে আছে; সে যেন নিজে যা খায় ভাইকেও তা-ই খাওয়াবে এবং পরাবে।

তার উচিত তাদের উপর কাজের এমন বোঝা না চাপানো যা তাদের পক্ষে বহন করা দুষ্কর হয়। যদি একান্ত এমনটি করতে হয় তবে তাদেরকে যেন সহযোগিতা করে” (আবু দাউদ খ.৪, ৩৬০৪)।

সমগ্র মানবতার প্রতি উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা

খ্রিস্টান ধর্মে মানবতাকে শ্রদ্ধা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বটে; তবে ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো, এতে ব্যক্তিগত জীবন থেকে সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের সকল মানবিক অধিকারের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) পরিষ্কারভাবে বলেছেন, “যে অন্যের প্রতি দয়া দেখাবে না, তার প্রতিও দয়া প্রদর্শন করা হবে না” (আল বুখারি হা.নং- ৬৯৪১)। স্বয়ং আল্লাহর রাসুল পুরো সৃষ্টিজগতকে আল্লাহর পরিবার আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.

“সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহর পরিবার। কাজেই আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণে যে সবচেয়ে অগ্রবর্তী সে-ই আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়” (আবু ইয়ালা ১৯৪)।

পৃথিবীতে ইসলামই কেবল এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা যা যুদ্ধের সময়ও শত্রুর প্রতি সদাচার ও মানবাধিকার সুরক্ষার জোর তাগিদ দেয়। অর্থাৎ কোথাও সেনা অভিযান পরিচালনা অথবা যুদ্ধ সংঘটিত হলে সেখানে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও কৃতদাসদের আঘাত করা যাবে না। কেবল এটুকুই নয়; বরং তার চেয়ে বড় কথা হলো, শত্রুর ক্ষেতখামার, ফসল, বাড়িঘর ও সম্পদ ধ্বংস করতে ইসলাম সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

বর্ণিত আছে, وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان.

“আমরা আল্লাহর রাসুলের নেতৃত্বে এক যুদ্ধে একজন নারীর লাশ দেখতে পাই; তখন তিনি নারী ও শিশুদেরকে হত্যার ব্যাপারে আমাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দেন” (আল বুখারি হা.নং-২৮৫২)। ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো, তার যুদ্ধনীতিও শান্তি-নিরাপত্তার বার্তা বহন করে। এ-কারণেই যুদ্ধ চলাকালে নির্দোষ, নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যার অনুমতি দেওয়া হয় না।

মৃতদের প্রতি উদার মানবিকতা

কেউ যদি ইসলামের সর্বমানবিক চেহারার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়, ইসলামের মানবাধিকার আইনগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। ইসলাম একদিকে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষকে সম্মান করতে শেখায়; একইভাবে মৃত লোকদের প্রতিও মানুষ হিসেবে সম্মান দিতে নির্দেশ দেয়। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি–তিনি যে ধর্মাবলম্বীই হোন– তাকে সম্মান করতে হবে। ইসলাম যে আপাদমস্তক মানবতার জন্য সরাসরি রহমত ও আশির্বাদ সে প্রসঙ্গে জাবের ইবন্ আবদুল্লাহ বলেন,

مرت بنا جنازة فقام لها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقمنا له فقلنا : انها جنازة يهودي ! قال : اذا رائيتم الجنازة فقوموا :

“আমাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করছিলো। এটা দেখে আল্লাহর রাসুল দাঁড়িয়ে গেলেন; তাঁর সঙ্গে আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। আমরা বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ এটা একজন ইহুদির জানাযা ! তিনি বললেন, তোমরা কোনো জানাযা যেতে দেখলে দাঁড়াবে” (আল বুখারি হা.নং-১২৪৯)।

বস্তুত, এখানে আল্লাহর রাসুল মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে মানুষটির ধর্ম বিবেচ্য বিষয় নয়। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, রাসুল (সা.) মৃত্যুর পরও মানুষের লাশকে পর্যন্ত সম্মান করতে বলেছেন, অথচ আমরা জীবিত মানুষকে সম্মান দেওয়া হয় এমন সমাজও প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি।

সারকথা

আল্লাহর প্রেরিত আসমানি ধর্মসমূহের মধ্যে ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মে সীমালঙ্গণ পাওয়া যায়। এই দুটি ধর্মে এসব বিধানমতে আমল করা আজকের দিনে শুধু কঠিন নয় রীতিমতো অসম্ভব। ইফরাত-তাফরীত অর্থাৎ বাড়াবাড়ি আছে এমন শিক্ষা ও নির্দেশনা বর্তমান দুনিয়ায় মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। অথচ অন্যদিকে ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতি ও নেতিবাচক উভয়দিকের মাঝে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবের সঙ্গে মিলে যাওয়া ইসলামের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। কাজেই ইসলামে কেবল ধর্মীয় উদারতা নয় বরং মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই উদারতা বিস্তৃত। শত্রুর প্রতি, অমুসলিমদের প্রতি উদারতা এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সৌহার্দ, বন্দিদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের শিক্ষা যেভাবে দিয়েছে; অনুরূপভাবে মৃত আর নিহতদের প্রতিও ঔদার্য আর মানবিকতার শিক্ষা ইসলামের অনন্য সমুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। ইসলামের আদর্শ ধারণ করার ফলে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হয়েও সবসময় সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও সহাবস্থানে বিশ্বাসী। ভিন্নধর্মীদের যাবতীয় ন্যায্য অধিকার দানে তারা অকৃপণ ও সদা সোচ্চার।

তথ্যসূত্র

আল কুরআনুল করিম

আল বায়হাকি, আবু বকর আহমদ ইবন্ হোসাইন, *আস সুনান আস সাগির*, বৈরুত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯২।

আস সুয়ূতি, জালালুদ্দিন, *আল জামিউস সাগির*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪।

আলী, ড. আহমদ, *ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১০।

আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ, কুয়েত, আল ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশশুয়ুনিল ইসলামিয়াহ, ১৯৯৫।

আল বুখারি, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ, *আল জামি আস সহিহ*, দামেশক : দারুল কলম, ১৯৮১।

আল কারযাভি, ড. ইউসুফ, *অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের উদারতা*, (অনু.) মাহমুদুল হাসান, চট্টগ্রাম : আশরাফিয়া লাইব্রেরি, ১৯৯৪।

আবু দাউদ, *আস সুনান*, বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪।

আবু ইয়ালা, *আল মুসনাদ*, দামেশক : দারুল মামুন, ১৯৮৪।

ইবন্ হাম্বল, আবু আবদুল্লাহ আহমদ, *আল মুসনাদ*, বৈরুত : আল মাকতাবা আল ইসলামি, ১৯৭৮।

ইবন্ কাসীর, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, বৈরুত : দারুল ফিক্র, তা. বি.।

ইবন্ আসাকির, আবুল কাসেম আলী, *তাহযিবু তারিখি দিমাশক আল কাবীর*, বৈরুত : দারুল মাসিরাহ, ১৯৭৯।

মাসউদ, মাওলানা ফরিদুদ্দিন, *ইসলাম ও মানবাধিকার*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সং.২য়, ২০০৮।

শাহবাজ, মুহাম্মদ *সিরাতে রাসুলকে রুশনী মে রওয়াদারী*, ইসলামাবাদ : মাকতাবায়ে আযহার, ২০০৩।